নওগাঁ: রানীনগর-আত্রাই

৫ বছরে ১৭ খুন

অনুসন্ধান করেছেন **সাইফুল হাসান** ও **রিপন হায়দার**

রাজশাহী থেকে নওগাঁ, দূরত্ব প্রায় ৮০ কিলোমিটার। বাসে দেড় ঘন্টার পথ। বাসে নওগাঁর শাহানাজ তৌহিদের সঙ্গে আলাপ। তিনি জানালেন, নওগাঁ এখন রক্তাক্ত জনপদ। রক্তের হোলিখেলা চলছে। গ্রামাঞ্চলের মোটামুটি সচ্ছল লোকেরা শহরের দিকে ছুটছে নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে। যাদের ভিটেমাটি ছেড়ে আসার মতো অবস্থা নেই, তারা সন্ত্রাসীদের দয়ায় বেঁচে আছে। শাহানাজ তৌহিদের মতে একে বেঁচে থাকা বলে না। যদিও এই অবস্থা শুধু নওগাঁর রানীনগর ও আত্রাই থানায় বিদ্যমান।

নওগাঁ পৌছাতে পৌছাতে শেষ বিকেল। আকাশে অবিরাম বিদ্যুতের ঝলকানি আর ঝিরঝির বৃষ্টি। বাসস্টেশন থেকে নওগাঁ শহরের দূরত্ব প্রায় ৩ কি. মি। বৃষ্টিতে ভিজে, অনেক খুঁজে একটা হোটেল পাওয়া গেল। সন্ধ্যায়ই রানীনগর ঘুরে আসতে চাইলাম। শহর থেকে রানীনগরের দূরত্ব ও এলাকা সম্পর্কে ধারণা নিতে হোটেল ম্যানেজারের শরণাপন্ন হলাম। রানীনগর যাওয়ার কথা শুনতেই ম্যানেজার নজরুল আঁতকে উঠলেন। কোনোভাবেই তিনি রানীনগরে যেতে দেবেন না। ম্যানেজার জানালেন, 'রানীনগর, আত্রাই সন্ত্রাসীদের অভয়ারণ্য। সন্ধ্যার আগেই সব মানুষ ঘরে ঢুকে পড়ে। এখন ওদিকে গেলেন রাতে যদি না ফেরেন এবং কাল সকালে আপনার গলা কাটা লাশ পাওয়া গেলে কেউ অবাক হবে না। আত্রাই-রানীনগরে এগুলো এখন স্বাভাবিক ঘটনা। আপনি দিনের আলোয় সেখানে যাবেন আর ফিরে আসবেন।' বাধ্য হয়েই শহরে স্থানীয় একজনের শরণাপন্ন হলাম। যার বাড়ি রানীনগর থানার একটি গ্রামে। লোমহর্ষক কয়েকটি হত্যাকান্ডের কথা শোনালেন। সঙ্গে জানালেন এ-সকল হত্যাকান্ডের কোনোটিরই বিচার হয়নি। বিচার হবার কোনো সম্ভাবনাও নেই। কারণ হলো প্রকৃত হত্যাকারীদের মামলার আসামি করা হয়নি। প্রায় প্রতিটি মামলা হয়েছে রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে হয়রানি করার জন্য প্রকৃত হত্যাকারী সব সময় আড়ালে থেকেছে। ফলে হত্যাকারীরা আরও হত্যা করতে উৎসাহিত হয়েছে।

দুটি হত্যাকান্ড

অ্যাডভোকেট আব্দুস সোবহান চৌধুরী। আত্রাই উপজেলা বিএনপি নেতা। মুনিয়ারী ইউনিয়নের প্রাক্তন চেয়ারম্যান। নৈদীঘি উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক। পক্ষাঘাতগ্রস্ত। নিরাপত্তার কারণে নওগাঁ শহরেই থাকতেন। প্রয়োজনীয় কাজে তিনি কখনও তার নিজগ্রাম নৈদীঘি গেলেও দিনের আলো থাকতেই শহরে ফিরতেন। তার এই নিরাপত্তাহীনতার কথা তিনি নওগাঁর প্রাক্তন এসপি খান হাসান সাইদকে জানিয়েছিলো। হাসান সাইদ তার জন্য প্রয়োজনীয় নিরাপত্তার ব্যবস্থাও করেছিলেন। হঠাৎ করেই এ বছরের শুরুর দিকে এসপি বদলি হয়ে যায়। এসপি চলে যাওয়ার সময় তাকে সোবহান চৌধুরী জানিয়েছিলেন, আপনি চলে গেলেই আমাকে মেরে ফেলবে। সরকারি চাকরি আর আদেশ মানতেই এসপি খান হাসান সাইদকে বগুড়ায় যেতে হয়। নওগাঁয় থেকে যান অ্যাডভোকেট সোবহান চৌধুরী। নিরাপত্তাহীন জীবন আর অনেক মানুষ বা স্বজনের মাঝেও একা। অনেক মানুষ তাকে স্বস্তি দিত না। বরং তার দু'চোখ অনেক মানুষের ভিড়ে অচেনা গুপ্ত ঘাতকদের খুঁজে বেড়াতো। এক সময় এই শহর ও তার কাছে নিরাপদ মনে হতো না। যে জন্য তিনি সব সময় সতর্ক থাকতেন। ৩০ আগস্ট শুক্রবার। একটু সকালেই বাসা থেকে বের হন। প্রথমে যান আত্রাই থানা সদরে। সেখানের কাজ সেরে বাসযোগে নিজগ্রাম নৈদীঘির উদ্দেশে রওনা হন। বাসটির নাম 'সারথী'। সোবহান চৌধুরীর যখন বাসে ওঠেন তখন তার ঘাতকরা বাসের ভেতরে যাত্রীবেশে। সোবহান চৌধুরী সঙ্গী কিশোর ভাতিজা। বিভিন্ন জায়গায় থেমে থেমে দশটার দিকে বাসটি বলরামচক মোড়ের কাছে পৌছায়। ঘাতকরা উঠে দাঁড়ায়। ১২ জনের গ্রুপের একজন বাস ড্রাইভারের গলায় চাকু ঠেকিয়ে বাস থামায়। সোবহান চৌধুরী তখনও বুঝতে পারেনি কি ঘটতে চলেছে। ঘাতকদের দু'জন সোবহান চৌধুরীকে এলোপাতাড়ি ছুরিকাঘাত করে। বয়স্ক তার ওপর পক্ষাঘাতগ্রস্ত মানুষের পক্ষে এতোগুলো পশুর সঙ্গে যুদ্ধ করে জেতা সম্ভব নয়। আত্মসমর্পণ মেনে নিয়ে বারবার কাকুতি মিনতি করেন। যে কেনো কিছুর বিনিময়ে জীবন ভিক্ষা চান। এই অসহায়ত্ব দেখেও ঘাতকদের মায়া হয় না। সাহসী দু'একজন যাত্রী প্রতিবাদ করার চেষ্টা করলেও অস্ত্রের সামনে অসহায় হয়ে একজন বৃদ্ধের করুণ হত্যার বীভৎস রূপ দেখে। বৃদ্ধের কিশোর ভাতিজা কাঁদতে কিংবা চিৎকার করার কথা ভুলে যায়। হত্যাকারীরা সোবহান চৌধুরীকে টেনে হিঁচড়ে বাস থেকে নামায়। তারপর জীবিত সোবহান চৌধুরীকে বাসের সিড়ির গোড়ায় ৪/৫ জন ঠেসে ধরে। একেবারে পশু কোরবানির মতো। এরপর গলায় ধারালো ছুরি চালায় একজন। মুহূর্তেই জীবিত মানুষটি জবাই হয়ে যায়। সদ্য জবাই করা দেহটি কিছুক্ষণ ছটফট করার পর একসময় নিস্তেজ হয়ে আসে। শেষ হয় একটি জীবন, একজন মানুষের সফল কিংবা অসফল অধ্যায়। এরপর হত্যাকারীরা উল্লাস করতে থাকে। বাসটি তখনও দাঁড়িয়ে। যেন একজন যাত্রী প্রয়োজনে নিচে নেমেছে, ফিরে এলেই গন্তব্যে ছুটবে। হত্যার কাজ শেষ হওয়ার পর ঘাতকরা 'জয় সর্বহারা, শ্রেণী শত্রু খতম কর, কৃষক শ্রমিকের রাজ কায়েম কর, পূর্ব বাংলার কমিউনিস্ট পার্টি জিন্দাবাদ' ইত্যাদি স্লোগান দিতে দিতে গ্রামের মধ্যে ঢুকে পড়ে। বলরামচক মোড়ে শত শত মানুষ এই ঘটনা প্রত্যক্ষ করে। কেউ প্রতিবাদ করতে এগিয়ে আসে না। নিথর প্রাণহীন সোবহান চৌধুরীর লাশ রাস্তায় পড়ে থাকে। তার রক্তে কালো পিচঢালা পথ রাঙা হয়।

মজিবর রহমান, ব্যবসায়ী। বাড়ি আত্রাই উপজেলার সিংসাড়া গ্রামে। আওয়ামী লীগের রাজনীতির সঙ্গে জড়িত ছিলেন। এলাকায় তার সুনাম-দুর্নাম দুটোই ছিলো। থানা পুলিশের সঙ্গেও তার সম্পর্ক ভালোই ছিল জানা যায়। আওয়ামী লীগ সরকারের সময় তিনি কিছু বাড়াবাড়ি করলেও তত্ত্বাবধায়ক সরকার আসার পর একেবারে চুপ হয়ে যান।

১০ জানুয়ারি ২০০২। মজিবর নিজের কাজকর্ম শেষ করে বিকেলের দিকে পার্শ্ববর্তী বজ্রপুর বাজারে। সেদিন হাটবার। হাজার হাজার লোক হাটে উপস্থিত। একাজ সেকাজ, এক, দু'জনের সঙ্গে কথা বলতে বলতে রাত হয়ে যায়

তার। রাত তখন আনুমানিক ৮টা। বাড়ি ফিরবে এমন সময় তার দেখা হয় পূর্ব পরিচিত একজনের সঙ্গে। দু'জনে মিলে কথা বলছিল। এই মজিবরের জীবনে শেষ কথা বলা। যদিও তাড়াতাড়ি বাড়ি ফেরার তাগিদ ছিল তার। হয়ত ইচ্ছা ছিল বাড়ি ফিরেই স্ত্রী পুত্র কন্যাদের সঙ্গে রাতের আহার সারবেন। স্বামীর ফেরার প্রতীক্ষায়ও ছিলেন তার স্ত্রী। কথাবলাকালীন সময়েই তার অলক্ষ্যে ১৫/২০ জনের একটি দল তাকে ঘিরে ধরে। সন্ত্রাসীরা প্রথমে কয়েক রাউন্ড ফাঁকা গুলি ছোড়ে। হাটে আসা হাজার হাজার মানুষ প্রাণভয়ে দিগ্বিদিক ছুটতে থাকে। মজিবরও পালাবার চেষ্টা করে। তার আগেই সন্ত্রাসী তাকে লক্ষ্য করে কয়েক রাউন্ড গুলি ছোড়ে। গুলিবিদ্ধ মজিবর রাস্তার ওপর পড়ে যায়। কয়েকজন তাকে ধরে ফেলে। প্রাণ নিয়ে পালানো হয় না মজিবরের। তরতাজা মজিবরকে জবাই করে তারা। হাজার হাজার হাটুরে এই দৃশ্য দেখে ভয়ে স্তব্ধ হয়ে যায়। এরপর সন্ত্রাসীরা পূর্বের মতই স্লোগান দিতে দিতে বজ্রপুর হাট ত্যাগ করে। বজ্রপুর বাজারে লাশ হয়ে পড়ে থাকে মজিবরের। স্বামীর বাড়ি ফিরতে দেরি দেখে তার স্ত্রী বাড়ির বাইরে পায়চারি করতে থাকে। তার দুই সন্তানও বাবার প্রতীক্ষায়। বাবা বাড়ি ফিরলেই এক সঙ্গে খেতে বসবে। কিছুক্ষণ পর উদ্বিগ্ন স্ত্রী ও সন্তানের কাছে মজিবর হত্যার খবর আসে। তার শিশু সন্তানদের রাতের খাবার খাওয়া হয় না। এই পরিবারের সঙ্গে পুরো গ্রামে একদিকে শোকের মাতম, অন্যদিকে আতঙ্কে অস্থির হয়।

উপরে মাত্র দুটো ঘটনার কথা উল্লেখ করা হলো। গত ৫ বছরে রানীনগর-আত্রাইয়ে এমন নৃশংস ও বীভৎস হত্যাকান্ড ঘটেছে ১৭টি। প্রতিটি হত্যাকান্ডের ভয়াবহতাই একে অন্যকে ছাড়িয়ে যাবে। অদ্ভুত ব্যাপার হচ্ছে প্রতিটি হত্যাকান্ডের পরপরই পূর্ব বাংলার কমিউনিস্ট পার্টি হত্যার দায় স্বীকার করে লিফলেট ছাড়ে। এতে জনগণের মাঝে আতঙ্ক বাড়ে। আতঙ্কের মাত্রা বাড়তে বাড়তে এমন অবস্থা হয় যে লোকজন ঘর থেকে বেরোতেই ভয় পায়। সরজমিনে দেখা গেছে, বিকেল হতে হতেই লোকজন ঘরে ঢুকে যায়, রাস্তাঘাট ফাঁকা হয়ে পড়ে। দোকানপাটও বন্ধ হয়ে যায় বললেই চলে। এ অবস্থার প্রেক্ষিতে আত্রাই থানায় পুলিশের ৫টি অস্থায়ী ক্যাম্প করা হলেও জনগণের আতঙ্ক একটুও কমেনি। বরং বেড়েছে বলা যায়। একদিকে সর্বহারা নামক সন্ত্রাসীদের হাতে প্রাণ হারানোর ভয়, অন্যদিকে জনগণের বন্ধু পুলিশের হয়রানি। এই এলাকায় কয়েক লাখ মানুষ কি অবস্থায় বেঁচে আছে তা সহজেই অনুমেয়। এলাকার প্রায় প্রতিটি মানুষ মনে করে পূর্ব বাংলার কমিউনিস্ট পার্টি তাদের মৃত্যুর পরোয়ানা নিয়ে ঘুরছে। মানুষকে এই অবস্থা থেকে মুক্ত করতে সরকারের তেমন কোনো কার্যকর উদ্যোগ লক্ষ্য করা যায়নি।

পূর্ব বাংলা কমিউনিস্ট পার্টি আছে-নেই

রানীনগর-আত্রাই থানায় প্রায় সবগুলো হত্যার দায় স্বীকার করেছে পূর্ব বাংলার কমিউনিস্ট পার্টি। হত্যাকান্ডের পর কেন হত্যা করা হয়েছে সে সংবলিত লিফলেটও তারা ছেড়েছে। কিন্তু বাস্তবিকই নওগাঁ জেলায় পূর্ব বাংলা কমিউনিস্ট পার্টির অস্তিত্ব আছে কি-না এ ব্যাপারে এলাকাবাসী ও পুলিশ প্রশাসন যথেষ্ট সন্দিহান।

১৯৭০ সালের দিকে পশ্চিমবঙ্গে নকশালবাড়ি আন্দোলন তুঙ্গে। শ্রেণীশত্রু খতমের নামে চারু মজুমদারের শিষ্যরা তখন মানুষ খুন করছে, কলকাতায় রবীন্দ্রনাথের মূর্তি ভাঙছে। শাসক-শোষক শ্রেণীর শ্রেণী চরিত্র আলাদাভাবে বিশ্লেষণ না করেই তারা নির্বিচারে মানুষ হত্যা করছে। এই আন্দোলনের ঢেউ এসে লাগে পূর্ব বাংলায়ও। সে সময়ই চারু মজুমদারের লাইনকে সঠিক মনে করে বাংলাদেশে গড়ে ওঠে পূর্ব বাংলার কমিউনিস্ট পার্টি। সে সময় মূলত বাম ছাত্র রাজনীতির সঙ্গে হত সমাজের সবচেয়ে মেধাবী অংশ। কমিউনিস্ট পার্টিতেও শিক্ষিত লোকেরাই নেতৃত্ব দিত একই সময় দেশে স্বাধীনতা যুদ্ধের ঢেউ লাগে। এ সময় পূর্ব বাংলার কমিউনিস্ট পার্টি মুক্তিযুদ্ধেরও বিরোধিতা করে। তারা স্বাধীনতা যুদ্ধকে দুই কুকুরের লড়াই মনে করত। এদের মধ্যে কেউ কেউ যে বিচ্ছিন্নভাবে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেনি তা অবশ্য নয়।

দেশ স্বাধীন হবার পর এরা গোপনে পার্টি গোছানোর উদ্যোগ নেয়। এক পর্যায়ে দেশের উত্তর ও দক্ষিণাঞ্চলে প্রায় সবগুলো কমিউনিস্ট পার্টিই জনগণের মাঝে বিশেষ করে এলাকাগুলোতে ভালই প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন পার্টির ভাঙন, বিশ্বরাজনীতির পট পরিবর্তনের ফলে বিপ্লবী কমিউনিস্ট পার্টি, জাসদের গণবাহিনী, পূর্ববাংলার কমিউনিস্ট পার্টির কার্যক্রম বরিশাল ও দক্ষিণাঞ্চলের কয়েকটি জেলার মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে। বারবার ভাঙ্গনে পার্টিগুলো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রুপে বিভক্ত হয়ে পড়ে। একটা সময় তাদের সামনে আদর্শ, সমাজতন্ত্র, কমিউনিস্ট পার্টি সব ফিঁকে হয়ে আসে। তারা শুরু করে সাধারণ মানুষের ওপর নির্যাতন, চাঁদাবাজি, হত্যা তো আছেই। এমনকি টাকার বিনিময়ে ভাড়ায়ও তারা মানুষ খুন শুরু করে। বর্তমানে এই হল পূর্ব বাংলার কমিউনিস্ট পার্টি। বিভিন্ন জায়গায় যোগাযোগ ও অনুসন্ধান করে জানা গেছে, পূর্ব বাংলার কমিউনিস্ট পার্টি বিলীন প্রায়। চুয়াডাঙ্গা, মেহেরপুর, কুষ্টিয়া, ঝিনাইদহকেন্দ্রিক কিছু কিছু জায়গায় তাদের কার্যক্রম আছে। জনগণের মধ্যে এই পার্টির কোনো প্রভাব না থাকলে অস্ত্র আর জীবনের ভয়ে কিছু কিছু লোক তাদের আশ্রয়-প্রশ্রয় দিয়ে থাকে।

নওগাঁর রানীনগর-আত্রাই, রাজশাহীর বাঘমারা, বগুড়ার নন্দীগ্রাম, সিরাজগঞ্জের বেলকুচি, নাটোরের সিংড়া, পাবনা জেলার দুটি থানা মোটামুটি প্রশাসনের দৃষ্টিতে সন্ত্রাস কবলিত এলাকা বলে পরিচিত। অনুসন্ধানে জানা গেছে, রানীনগর-আত্রাই এলাকায় পূর্ব বাংলার কমিউনিস্ট পার্টির অস্তিত্ব সম্পর্কে সন্দিহান হবার পেছনে অনেকগুলো কারণ বিদ্যমান। যে কোনো এলাকায় কোনো পার্টির ন্যূনতম কার্যক্রম থাকলেও এলাকার মানুষ তা জানবে বলে ধারণা করা যায়। তাদের এক বা একাধিক নেতা থাকবে। যাদের নাম এলাকায় প্রায় সব মানুষের জানার কথা। যেমন খুলনা অঞ্চলে তপন, চুয়াডাঙ্গা এলাকায় সবুজ-রুহুল, কেন্দ্রীয় নেতা মুফাখখর চৌধুরীর নাম সর্বজনবিদিত। কিন্তু নওগাঁর কোনো রাজনৈতিক নেতা, সাধারণ গ্রামবাসী, পুলিশ প্রশাসন কেউই ঐ এলাকার একজন নেতারও নাম বলতে পারেনি। অথচ পূর্ব বাংলা কমিউনিস্ট পার্টির নামে মানুষ হত্যা হচ্ছে। সরজমিনে একজন মানুষও তার গ্রামে

'পুলিশ শুধু আমার এলাকা নয়, সারা দেশেই অত্যাচার করছে। বরিশাল, খালেদা জিয়ার গাবতলীতে— কোথায় পুলিশের অত্যাচার নেই। রাষ্ট্র তো বিপন্ন। স্বাধীনতার পর থেকে রাজনীতিতে খারাপ লোকজন নেতৃত্বে এসেছে। রাজনীতি তো শেষ— নেতৃত্বে আসছে খারাপ লোক, সেখানে পুলিশ কি জনগণের সঙ্গে ভালো আচরণ করবে? এলাকায় ক্যাম্প হওয়ায় জনগণের আতঙ্ক কিছুটা কমেছে। পুলিশ তো এলাকায় হত্যা চায়। পুলিশ দুর্বৃত্ত হয়ে গেছে। পুলিশ আমার এলাকার মানুষকে সর্বস্বান্ত, ফতুর করে দিয়েছে'

আলমগীর কবির, *প্রতিমন্ত্রী, গণপূর্ত ও গৃহায়ণ মন্ত্রণালয়*

রাতে তাদের এলাকায় অপরিচিত সশস্ত্র ব্যক্তিদের আনাগোনা, মিছিল মিটিংয়ের কথা জানাতে পারেনি। সেক্ষেত্রে আদৌ অত্র এলাকায় এই পাটির কার্যক্রম আছে কি না সেটা প্রশ্নের সম্মুখীন হয়। যে কারণে প্রশ্ন আসে হত্যাকান্ডগুলো ঘটাচ্ছে কারা? আবার কেউ কেউ আছেন যারা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন এই পার্টির তৎপরতা আছে। তাদের একজন খায়রুল ইসলাম। আত্রাই প্রেসক্লাবের সভাপতি। স্বাধীনতা পরবর্তীকালে তিনি কিছুদিন আন্ডারগ্রাউন্ড রাজনীতির সঙ্গে জড়িত ছিলেন। তিনি বলেন, 'পার্টির অস্তিত্ব তো আছেই। তা না হলে হত্যাগুলো করছে কারা। আমি যতদূর শুনেছি রাজশাহীর বাঘমারা থানার সাইদ মেকার নামের একজন এ এলাকার নেতৃত্ব দিচ্ছে। আরও একজন ডাক্তারের কথাও শুনেছি। তিনি একবার অস্ত্রসহ নওদুলী বাজারে ধরা পড়েছিল। এরা গ্রাম মুক্ত করে গ্রাম দিয়ে শহর ঘেরাও করতে চায়। এলাকায় আতঙ্ক তৈরি করে তারা হয়ত এ এলাকায় তাদের জায়গা ও প্রভাব বিস্তার করতে চাচ্ছে। কোনো কার্যক্রম না থাকলে তারা কেন হত্যাকান্ডের দায় স্বীকার করবে।' নওগাঁ জেলার পুলিশ সুপার মোস্তাফিজুর রহমান পিপিএম সাপ্তাহিক ২০০০কে বলেন, 'বাস্তব অর্থে তাদের কোনো রাজনৈতিক কার্যক্রম দেখি না। আমার এলাকায় সর্বহারা বা পূর্ব বাংলার কমিউনিস্ট পার্টি বলে কিছু নেই। এখানে যতগুলো হত্যাকান্ড ঘটেছে তার পেছনের মূল কারণ হচ্ছে পারিবারিক বা জমিজমা সংক্রান্ত গন্ডগোল।' নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একজন পুলিশ কর্মকর্তা বলেন, 'সর্বহারা, পূর্ববাংলা কমিউনিস্ট পার্টি এগুলো বোগাস কথা। কিছু প্রফেশনাল কিলার এই ঘটনাগুলো ঘটাচ্ছে বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের ছত্রছায়ায়। এলাকার দু'তিন নেতা স্ট্রোক করে মারা গেলে সব কিছু বন্ধ হয়ে যাবে।' এক সময়ের নওগাঁ এলাকার বিখ্যাত কমিউনিস্ট নেতা ওহিদুর রহমান সাপ্তাহিক ২০০০কে বলেন, আমার ধারণা এসব হত্যাকান্ডের পেছনে স্থানীয় কিছু লোকের সঙ্গে বাইরের কিছু লোকও অংশগ্রহণ করে।'

শুরু অনেক পেছনে

স্বাধীনতার আগে ও পরেও কিছুকাল নওগাঁর রানীনগর-আত্রাই ইউনাইটেড কমিউনিস্ট লীগের মুক্তাঞ্চল ছিল। তৎকালীন সময়ে এই এলাকার পার্টির নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন ওহিদুর রহমান, বর্তমান গণপূর্ত ও গৃহায়ন প্রতিমন্ত্রী আলমগীর কবির ও তার ভাই আনোয়ার হোসেন বুলু। দেশ স্বাধীন হবার পর '৭২ সালে গ্রেপ্তার হন ওহিদুর রহমান। '৭৭ সালে তিনি মুক্তি পান। ওহিদুর রহমান যখন জেলে তখনও আলমগীর কবির ও আনোয়ার হোসেন বুলু পার্টি বিকাশের জন্য কাজ করে যাচ্ছে। স্থানীয় অনেকেই বলেন, ওহিদুর রহমান ও আলমগীর কবির তখন একই পার্টির নেতা। এবং রানীনগর ও আত্রাই কমিউনিস্ট পার্টির প্রভাব এতোটাই ছিল যে, কেউ কোনো কথা বলার সাহস পেত না। এ এলাকায় কমিউনিস্ট পার্টি নিধনের জন্য মুজিব সরকারকে রক্ষীবাহিনী নামাতে হয়। জানা যায়, একটানা প্রায় ২০ দিন যুদ্ধ করার পর রক্ষীবাহিনী ইউনাইটেড কমিউনিস্ট লীগের মুক্তাঞ্চলে নিয়ন্ত্রণ নিতে সক্ষম হয়। সে সময় প্রচুর কমিউনিস্ট নেতা-কর্মী রক্ষীবাহিনীর হাতে হতাহত ও গ্রেপ্তার হয়। গ্রামকে গ্রামকে তছনছ করে রক্ষীবাহিনী। মুজিব হত্যার কিছু আগে বা পরে আলমগীর কবিরও গ্রেপ্তার হন। জিয়াউর রহমান ক্ষমতায় আসার পর বিএনপিতে যোগদান করে তিনি জেল থেকে বেরিয়ে আসেন। ওহিদুর রহমান ও আলমগীর কবির পার্টিচ্যুত হলে ঐ এলাকায় ইউনাইটেড কমিউনিস্ট লীগের প্রভাব দখলদারিত্ব এমনকি সংগঠনও শেষ হয়ে যায়। এরপর ওহিদুর রহমান কয়েকবার দল বদল করলেও আলমগীর কবির বিএনপি রাজনীতির সঙ্গেই থেকে যান। '৯০-এর দশকের শেষ দিকে হঠাৎ করেই এ এলাকায় পূর্ব বাংলার কমিউনিস্ট পার্টির তৎপরতা শুরু হয়। '৮৮ সালে বিএনপি কর্মী কালুকে আওয়ামী লীগের কর্মীরা হত্যা করে বলে জনশ্রুতি রয়েছে। যদিও অনেকেই মনে করেন এই হত্যাকান্ডে পূর্ব বাংলার কমিউনিস্ট পার্টির সন্ত্রাসীদের সম্পৃক্ততা ছিল। পূর্ব বাংলার কমিউনিস্ট পার্টির 'খ' এলাকা সাংগঠনিক কমিটির একটি লিফলেট থেকে জানা যায় ১৯৯৫ সালের কিছু আগে তারা এই এলাকায় নতুন করে কাজ শুরু করে। আওয়ামী লীগ সরকার '৯৬ সালে ক্ষমতায় আসার পর তাদের কার্যক্রম আরও বেড়ে যায়। '৯৮ সালে যুবলীগ নেতা লাল মোহাম্মদ লালু হত্যার মধ্য দিয়ে এ এলাকায় নতুন করে হত্যার রাজনীতি শুরু হয়। প্রথম প্রথম স্থানীয় জনগণ এ হত্যাকান্ডকে অভ্যন্তরীণ কোন্দল মনে করে। পরে আরও কয়েকটি হত্যাকান্ড ঘটলে এলাকাবাসীর ধারণা বদলাতে থাকে। কারণ প্রতিটি হত্যাকান্ড শেষে 'কেন হত্যা করা হয়েছে' এই মর্মে এলাকায় লিফলেট ছাড়ে। প্রচুর লিফলেট আর প্রকাশ্য দিবালোকে হত্যাকান্ডের ফলে জনগণ আতঙ্কিত হয়ে পড়ে। এক সময় আতঙ্ক স্থানীয় জনগণের জীবনে চেপে বসে যা আজও চলছে।

অদ্ভুত ব্যাপার হলো আওয়ামী লীগ আমলে যারা খুন হয়, তার অধিকাংশই আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মী। হত্যাকান্ডগুলো ঘটার পর স্থানীয় আওয়ামী লীগ বিএনপি নেতা আলমগীর কবিরকে দোষারোপ করতে থাকে। আলমগীর কবিরের সঙ্গে পূর্ব বাংলার কমিউনিস্ট পার্টির সম্পর্ক আছে বলে আওয়ামী লীগ দাবি করতে থাকে। আলমগীর কবির বরাবরই এ অভিযোগ অস্বীকার করে আসছে। স্থানীয় একজন সাংবাদিক জানান, 'সে সময় বিএনপি থেকেও বলা হয় ওহিদুর রহমানের পূর্ববাংলা কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে যোগাযোগ আছে। তিনি এলাকার নেতা। তার নির্দেশেই এসব হত্যাকান্ড ঘটছে।'

নওগাঁ-রানীনগর-আত্রাই ঘুরে বিভিন্ন পেশার মানুষের সঙ্গে কথা হয়। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক সাংবাদিক, পুলিশ কর্মকর্তা, ব্যবসায়ী সাপ্তাহিক ২০০০ কে বলেন, 'বিভিন্ন ঘটনা বিশ্লেষণ করে আমাদের ধারণা হয়েছে এ সকল হত্যাকান্ডের সঙ্গে ওহিদুর রহমান, আলমগীর কবির ও বুলুর সরাসরি সম্পৃক্ততা না থাকলেও তারা জানেন কেন এবং কারা এই হত্যাকান্ড ঘটাচ্ছে। কিন্তু তারা এগুলো বন্ধের কোনো পদক্ষেপ নিচ্ছেন না।' খায়রুল ইসলাম বলেন, 'সন্ত্রাসীরা এলাকাকে ভাগ করে নিয়েছে। এখানে এতো হত্যা, রক্ত কেন? এর নেপথ্যে কারা এটা আমার মতো এলাকাবাসী, ওহিদুর রহমান, আলমগীর কবির, বুলু সবাই জানে। কিন্তু কারও বুকের পাটা নেই সম্মিলিতভাবে এগুলো ঠিক করবে। কারণ প্রত্যেকেরই ব্যক্তিগত স্বার্থ আছে।'

ওহিদুর রহমান বলেন, 'গত বছর আমি জনসভা করে বলেছি নিজেকে রানীনগর-আত্রাইয়ের রাজনীতি থেকে সরিয়ে নিলাম। মানুষ আমার সম্পর্কে ধারণা করলে কি করবো? ঐ

'এটা ঠিক যে হত্যাকান্ডগুলো ঘটার পর মামলাগুলো সঠিকভাবে করা হয়নি। রাজা-অরুণ মারা যাওয়ার পর গণহারে বিএনপি নেতা-কর্মীদের নামে কেস দেয়া হয়েছে। এটা খুব অন্যায় হয়েছে। রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে হয়রানি করতে গিয়ে মামলাগুলো শেষ করে দেয়া হয়েছে। এখন তো এটাই চলছে। এখন গণহারে আওয়ামী লীগ নেতা-কর্মীদের নামে কেস দেয়া হয়েছে। ফলে কোনো হত্যাকান্ডেরই সঠিক বিচার করা সম্ভব হচ্ছে না বা হবে না'

ওহিদুর রহমান *স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতা*

জনসভায় আমি আলমগীর কবির ও আনোয়ার হোসেন বুলুকে উদ্দেশ্য করে বলি, 'মানুষকে শান্তিতে ঘুমাতে দিন। আপনারা পূর্ব বাংলা কমিউনিস্ট পার্টি ছেড়ে বেরিয়ে আসুন। এরপর থেকে আমি কোনো ভাবেই রানীনগর-আত্রাইয়ের রাজনীতির সঙ্গে জড়িত নই। আমার জীবনের ওপরও তো হুমকি এসেছে। তাহলে কিভাবে আমার সঙ্গে ঐ পার্টির সম্পর্ক থাকবে।' এ বিষয় নিয়ে গণপূর্ত ও গৃহায়ন প্রতিমন্ত্রী আলমগীর কবিরের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়। সাপ্তাহিক ২০০০কে আলমগীর কবির বলেন, 'আমি ঐভাবে বাম রাজনীতির সঙ্গে ছিলাম না। উন্নয়নমূলক কাজ করেছি। আওয়ামী লীগাররা আমার নামে বিএনপি নেতা-কর্মীদের নামে মিথ্যা মামলা দিয়েছে। এলাকায় যা উন্নয়ন কাজ দেখেছেন তার সবই আমার করা। একটি গ্রুপ পরিকল্পিতভাবে রানীনগর-আত্রাইকে সন্ত্রাসের দিকে নিয়ে গেছে।' তারা কারা? উত্তরে তিনি বলেন, 'তাদের জনগণ চেনে, পুলিশ চেনে। আমি কেন তাদের নাম বলবো? আপনার কি মনে হয়? এলাকার লোকজন কি বলেছে আমি নিষিদ্ধ পার্টি বা হত্যাকান্ডের সঙ্গে জড়িত? হ্যাঁ আমার ধারণার কথা যদি বলেন তবে বলবো হ্যাঁ, পূর্ব বাংলা কমিউনিস্ট পার্টির কিছু কাজকর্ম তো আছেই। তাদের পোস্টার লিফলেট দেখে তাই মনে হয়।'

এসব নেতাদের সম্পৃক্ততা থাক বা না থাক এলাকাবাসীর দৃঢ় বিশ্বাস এসব হত্যার পেছনে কারও না কারও রাজনৈতিক মদদ রয়েছে। তাদের ধারণা আওয়ামী লীগ-বিএনপি কেউই এটা প্রতিরোধ করতে চায় না। রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ চায় না ফলে প্রশাসনও তেমন কার্যকর কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করে না। ফলে হত্যাকারীরা নির্বিঘ্নে হত্যা করে, তাদের কোনোভাবেই বিচারের কাঠগড়ায় নিয়ে যাওয়া সম্ভব হয় না।

হত্যাকান্ড এবং পুলিশের চাঁদাবাজি

রানীনগর-আত্রাইয়ে দিনদুপুরে মানুষ জবাই, তার পাশাপাশি পুলিশের গণচাঁদাবাজির শিকার অসংখ্য মানুষ। একদিকে মৃত্যুভয়, অন্যদিকে পুলিশ। স্থানীয় লোকদের এর থেকে যেন মুক্তি নেই।

আবু হাসান ডিসি কোর্টে স্থানীয় সরকার শাখার পরিসংখ্যান সহকারী। ১০ বছর যাবৎ তিনি এখানেই চাকরি করছেন। মাহমুদ মুসা, সাংবাদিক ও কলাম লেখক। এ দু'জন আপন ভাই। মাহমুদ মুসা বিএনপি সমর্থক। এদের বাড়ি রানীনগর থানার শিকারপুর গ্রামে। একটি মামলায় তাদের উদ্দেশ্যমূলকভাবে পুলিশ জড়িয়েছে। জানা যায়, পূর্ববাংলার কমিউনিস্ট পার্টির চাঁদা দাবি করা একটি চিঠিসহ এক যুবক গ্রামবাসীর হাতে ধরা পড়ে। এরপর এ সংক্রান্ত একটি মামলা হয়। মামলার এজাহারে বাদী কোথাও আবু হাসান ও মাহমুদ মুসার নাম উল্লেখ করেনি। হঠাৎ করেই একদিন মাহমুদ মুসাদের থানায় ডাক পড়ে। সার্জেন্ট আমিনুল তাদের জানায় ৫০ হাজার টাকা না দিলে তাদের এই মামলায় ঢুকিয়ে দেয়া হবে। তখন মাহমুদ মুসারা কিছুটা অবাক হয়ে প্রতিবাদ করে। কিন্তু সার্জেন্ট আমিনুল অনড়। একপর্যায়ে বাধ্য হয়েই তারা সার্জেন্ট আমিনুলকে ২০ হাজার টাকা দেয়। অনুসন্ধানে জানা যায়, গ্রাম্য রাজনীতিতে মাহমুদ মুসাদের প্রতিপক্ষ তাদের ঘায়েল করতেই পুলিশের সাহায্য নেয়। ২০ হাজার টাকায় খুশি হয় না সার্জেন্ট আমিনুল। আরও টাকা দাবি করে সে। মাহমুদ মুসা টাকা দিতে অস্বীকার করে। চার্জশিটে তাদের নাম ঢুকিয়ে দেয় পুলিশ। আবু হাসানরা দু'ভাই বর্তমানে জামিনে মুক্ত। সর্বশেষ জানা গেছে সার্জেন্ট আমিনুল ১০ হাজার টাকা ফেরত দিয়েছে স্থানীয় রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের চাপে। শত শত ঘটনার এটা একটি উদাহরণ মাত্র।

আত্রাই প্রেসক্লাবের সভাপতি সাপ্তাহিক ২০০০কে জানান, 'সর্বশেষ সিংসাড়া গ্রামের একটি হত্যাকান্ডে আত্রাই পুলিশ স্থানীয় একজন ডাক্তারের কাছে এক লাখ টাকা চাঁদা দাবি করে। পরে সে ৫০ হাজার টাকা দিয়ে পুলিশের হাত থেকে বাঁচে।' আত্রাই থানা শহরে এই ডাক্তারের দোকানও আছে। ডাক্তারের নিরাপত্তার কথা ভেবেই খায়রুল ইসলাম তার নাম বলতে অস্বীকৃতি জানালেন। পুলিশের চাঁদাবাজি সম্পর্কে বলতে গিয়ে তিনি বলেন, 'পাকিস্তান আমল থেকে পুলিশের অত্যাচার দেখছি। পুলিশ সত্যিই অত্যাচারী। সরকারের পুলিশ বিভাগ বন্ধ করে দেয়া উচিত। পুলিশ তো চাঁদাবাজি করছেই। এলাকায় একের পর এক খুন দেখে জনগণের প্রাণ ওষ্ঠাগত। জনগণের আতঙ্ক কাটানোর জন্য আত্রাই-রানীনগরের পুলিশ ক্যাম্প বসানো হয়েছে। এতে আতঙ্ক কাটেনি বরং বেড়েছে। পুলিশের চাঁদাবাজি নিয়ে কি বলবো ভাই। নওগাঁ সীমান্তবর্তী জেলা, ফলে ভারতীয় মাল পাওয়া যায় এখানে। এখানে পুলিশ অবৈধ মালের জন্য আহসানগঞ্জ স্টেশন নিলামে তোলে। আগে এই স্টেশনের দাম উঠতো ৮০/৯০ হাজার টাকা। এ মাসে দাম উঠেছে ৫৫ হাজার টাকা। শুনেছি এই টাকা তোলা হয় নওগাঁ এসপি'র নামে। পুলিশের অত্যাচারের কথা বলে শেষ হবে না।'

সরজমিনে রানীনগর-আত্রাইয়ের জনসাধারণকে পুলিশ ও সর্বহারা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেই তারা আঁৎকে উঠেছে। কথা না বলে এড়িয়ে যায়। আত্রাই বাজার নৈদীঘি গ্রাম, রানীনগর থানা সদর, পতিসরসহ বিভিন্ন এলাকার মানুষকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা

সোবহান চেয়ারম্যান খতমের মাধ্যমে

হত্যার পর এরকম লিফলেট ছাড়া হয়

হয়েছিল। হয় তারা এড়িয়ে গেছেন নতুবা বলেছেন জানি না। পুলিশ বরাবরের মতোই এসব অভিযোগ অস্বীকার করেছে। পুলিশের চাঁদাবাজি সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে আওয়ামী লীগ নেতা ওহিদুর রহমান সাপ্তাহিক ২০০০কে বলেন, 'পু-লি-শ! পুলিশ সম্পর্কে নতুন করে কি বলবো? পুলিশ সব জানে। এলাকায় একটা মার্ডার মানেই পুলিশের উৎসব শুরু হয়ে যায়। মার্ডার মানেই দু'তিনশ' লোককে তারা টার্গেট করে। এরপর শুরু হয় টাকা আদায়ের পালা।' স্থানীয় একজন সাংবাদিক সাপ্তাহিক ২০০০কে বলেন, 'আমরা হিসেব করে দেখেছি, একটা মার্ডার হলেই রানীনগর বা আত্রাই থানার ১৫ থেকে ১৭ লাখ টাকা আয় হয়। ১০ বছরের সাংবাদিকতার অভিজ্ঞতায় আমার ধারণা হলো, পুলিশ কোনোভাবেই চায় না খুনের রাজনীতি বন্ধ হোক।' অনুসন্ধানে সবগুলো পুলিশ ক্যাম্প ও থানা নিয়ে কম-বেশি অভিযোগ থাকলেও সবচেয়ে বেশি অভিযোগ এসেছে সিংসাড়া-দমদমা পুলিশ ক্যাম্প নিয়ে। আত্রাই রেল স্টেশনে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক ব্যবসায়ী বলেন, 'দমদমা-সিংসাড়া পুলিশ ক্যাম্পের অত্যাচারে সিংসাড়া, দমদমা, দীঘিরপাড়া, নৈদীঘিসহ আশপাশের কয়েক গ্রামের মানুষ অতিষ্ঠ। চরমপন্থীরা তো বেছে বেছে নেতা গোছের লোকজনকে মারছে। আর পুলিশ নেতা গোছের কাউকে ধরছে না। গ্রামের সাধারণ ও পয়সাওয়ালা মানুষকে ক্যাম্পে ডেকে নিয়ে এসে মামলায় ঢোকানোর কথা বলে টাকা আদায় করছে। যারা টাকা দিতে পারছে না তাদের নানাভাবে হয়রানি করছে।' পুলিশের চাঁদাবাজি নিয়ে জেলার দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী আলমগীর করিব সাপ্তাহিক ২০০০কে কিছুটা ক্ষোভের সঙ্গেই বলেন, 'পুলিশ শুধু আমার এলাকা নয়, সারা দেশেই অত্যাচার করছে। বরিশাল, খালেদা জিয়ার গাবতলীতে— কোথায় পুলিশের অত্যাচার নেই। রাষ্ট্র তো বিপন্ন। স্বাধীনতার পর থেকে রাজনীতিতে খারাপ লোকজন নেতৃত্বে এসেছে।

রাজনীতি তো শেষ– নেতৃত্বে আসছে খারাপ লোক, সেখানে পুলিশ কি জনগণের সঙ্গে ভালো আচরণ করবে? এলাকায় ক্যাম্প হওয়ায় জনগণের আতঙ্ক কিছুটা কমেছে। পুলিশ তো এলাকায় হত্যা চায়। পুলিশ দুর্বৃত্ত হয়ে গেছে। পুলিশ আমার এলাকার মানুষকে সর্বস্বান্ত, ফতুর করে দিয়েছে।'

হত্যার কারণ রাজনৈতিক নয়, ব্যক্তিগত

নওগাঁ জেলায় প্রচুর পরিমাণ খাস জমি রয়েছে। যদিও নওগাঁ প্রশাসনের কাছে খাস জমি সংক্রান্ত সঠিক হিসাব নেই। নৈদীঘি গ্রামে ৪টি হত্যাকান্ড ঘটে। হত্যাকান্ডগুলো ঘটে ৯০ বিঘার একটি খাস দীঘিকে কেন্দ্র করে। আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় আসার আগে দীঘির দখল ছিলো বিএনপি নেতা অ্যাডভোকেট আব্দুস সাত্তার চেয়ারম্যানের দখলে। সরকার পরিবর্তনের পর আওয়ামী লীগ নেতা লতিফ মেম্বার দীঘির দখল নেয়। গ্রামছাড়া হয় বিএনপি নেতা-কর্মীরা। দীঘি নেয়ার পর হঠাৎ করেই কৃষকলীগ নেতা গোলাম নবী নিহত হন। মামলা হয় বিএনপি'র নেতা-কর্মীদের নামে। যদিও অনেকেই মনে করেন দরিদ্র গোলাম নবীকে হত্যা করে লতিফ মেম্বারের লোকেরাই। সাত্তার চেয়ারম্যানকে ঘায়েল করতে লতিফ মেম্বারের সামনে এছাড়া আর কোনো পথ খোলা ছিলো না বলে জানান নৈদীঘি গ্রামের একজন। ৯০ বিঘা দীঘি মানেই বছরে লাখ লাখ টাকার নিশ্চিত সংস্থান। এই দীঘি ছাড়াও এ এলাকায় আরও ২৫০ বিঘা আবাদযোগ্য খাস জমি রয়েছে। এসকল জমি দখলে রাখতে পারলে কোটি কোটি টাকা আয়ের পথকে অবরুদ্ধ করে কে? এই চিন্তা থেকেই আওয়ামী লীগ-বিএনপি উভয় দলের নেতারাই এসকল খাস জমি দখলের জন্য যা যা প্রয়োজন তাই করেছে। দীঘির দখলকে কেন্দ্র করে পুরো গ্রাম দুই শিবিরে বিভক্ত হয়ে পড়ে। গোলাম নবীর মৃত্যুর ৭ মাসের মধ্যেই খুন হয় লতিফ মেম্বার। গ্রামবাসীর ধারনা, লতিফের হত্যার পেছনে সাত্তার চেয়ারম্যানের হাত ছিলো। এর মাত্র ১০ মাসের মাথায় বগুড়ার নন্দীগ্রাম বাজারে বিএনপি নেতা অ্যাডভোকেট সাত্তার চেয়ারম্যান খুন হন। এর জের হিসেবে নৈদীঘি গ্রামে লুটপাট, নারী নির্যাতনের ঘটনাও ঘটে।

নৈদীঘির মতো রানীনগরেও রয়েছে ৫৭ বিঘা খাস জমি। খাস জমি ছাড়াও টেন্ডারবাজি, এলাকার ওপর নিয়ন্ত্রণ, চাঁদাবাজির ভাগবাটোয়ারাও হত্যাকান্ডগুলোর পেছনের কারণ বলে এলাকাবাসী মনে করে। রাজশাহী রেঞ্জের একজন ঊর্ধ্বতন পুলিশ কর্মকর্তা সাপ্তাহিক ২০০০ কে বলেন, 'এমনিতেই নওগাঁর মানুষ ভালো। আমি বেশ কয়েকটি হত্যাকান্ড অনুসন্ধান করেছি। আমি নিশ্চিত প্রায় প্রতিটি হত্যাকান্ডের সঙ্গেই রানীনগর ও আত্রাই এলাকার একটি কিলিং গ্রুপ আছে। যাদের পেশা হচ্ছে টাকার বিনিময়ে মানুষ খুন করা। আমি শুনেছি মাত্র ২০ হাজার টাকায় তারা মানুষ খুন করে। বিভিন্ন গ্রুপ তাদের প্রয়োজনে এই কিলিং গ্রুপকে কাজে লাগিয়েছে। রাজা-অরুণ হত্যাকান্ড ছাড়া বাকি সবগুলোর পেছনে খাস জমি দখল, এলাকায় প্রভাব বিস্তারসহ চাঁদার টাকার ভাগবাটোয়ারা নিয়ে ঘটেছে।' আলমগীর কবির বলেন, 'প্রতিটি হত্যাকান্ডের পেছনে ব্যক্তিগত স্বার্থ কাজ করেছে। রাজনৈতিক হত্যা নয় এগুলো। বেশির ভাগই জমিজমা, খাস জমি দখল কিংবা পারিবারিক গন্ডগোলের জের।' আওয়ামী লীগ নেতা ওহিদুর রহমানও মনে করেন, হত্যাকান্ডগুলোর অধিকাংশই ব্যক্তিগত স্বার্থকেন্দ্রিক।

খুন হয়েছে বিচার হয়নি, নষ্ট করা হয়েছে মামলা

৫ বছরে নওগাঁর দুই থানায় খুন হয়েছে ১৭ জন। একটারও বিচার হয়নি। বিচার হয়নি কারণ মামলাগুলো ঠিকমতো দায়ের করা হয়নি। প্রতিটি মামলায় একপক্ষ আরেক পক্ষকে ঘায়েল করতে পছন্দমত মামলা সাজিয়েছে। রানীনগর আত্রাইয়ে এলাকাবাসীর ধারণা, যারা হত্যাগুলো ঘটিয়েছে তারাই রাতের আঁধারে পূর্ব বাংলার কমিউনিস্ট পার্টির নামে লিফলেট ছাপিয়ে বিলি করেছে। আওয়ামী লীগের সময় খুন হয় ১৩ জন। এই ১৩টি মামলার প্রায় সবগুলো হয় বিএনপি কর্মীদের নামে। এর মধ্যে একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করা যায়। নওগাঁর এ যাবৎকালের সবচেয়ে চাঞ্চল্যকর ঘটনা হচ্ছে আত্রাই আওয়ামী লীগের সভাপতি সিদ্দিকুর রহমান রাজা ও শ্রমিক লীগের আহ্বায়ক অরুণ সরকার হত্যাকান্ড। এই জোড়া খুনের পর তৎকালীন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিম নওগাঁয় আসেন। তিনি একটি কম্বিং অপারেশনও চালান। যদিও তা পুরোপুরিভাবে ব্যর্থ হয়। এই মামলায় আসামি করা হয় বর্তমান গণপূর্ত ও গৃহায়ন প্রতিমন্ত্রী আলমগীর কবির ও আনোয়ার হোসেন বুলুসহ বিএনপি নেতাকর্মীদের নামে। একটি সূত্র থেকে জানা যায়, 'টাঙ্গাইল সার্কিট হাউজে বসে তৎকালীন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও নওগাঁ আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দ রাজা-অরুণ হত্যার মামলা তৈরি করেন। ঘটনার দিন আলমগীর কবিরের স্ত্রী ঢাকায় আসার পথে দুর্ঘটনাকবলিত হন। এবং আলমগীর কবির তার স্ত্রীকে খুঁজতে বের হন। রাতে টাঙ্গাইলের এএসপি তাকে অবহিত করেন, আলমগীর কবিরের বিরুদ্ধে মামলা হচ্ছে।

রানী নগরের ছাত্রলীগ নেতা নজরুল মারা যায় যুবলীগ নেতা চাঁদের সঙ্গে দ্বন্দ্বের কারণে। রানীনগরের দুটি পুকুর, সুতিজাল, দাদন ব্যবসা নিয়ে নজরুলের সঙ্গে চাঁদের থানা বারান্দায় হাতাহাতি পর্যন্ত হয়। পরে নজরুল সমর্থকরা চাঁদকে নির্মমভাবে পেটায়। এ ঘটনায় চাঁদ শপথ নেয় প্রতিশোধ নেয়ার। এর মাত্র আড়াই মাসের মধ্যে নজরুল চাঁদের এলাকা রাতোয়ালে খুন হয়। খুন হবার ৫দিন পর থানায় মামলা দায়ের হয়। এর মধ্যে থানার ওসিও বদল হয়। স্থানীয় অনেকের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়। প্রথমে নজরুলের পিতা বিএনপি নেতা-কর্মীদের নামে মামলা করতে অস্বীকৃতি জানায়। পরে থানা ও আওয়ামী লীগ নেতাদের চাপে পড়ে তিনি বিএনপি নেতা-কর্মীদের নামে মামলা করেন।

এভাবে মামলা দায়েরের ফলে এই মামলাগুলোর ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। এ সম্পর্কে স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতা ওহিদুর রহমান বলেন, 'এটা ঠিক যে হত্যাকান্ডগুলো ঘটার পর মামলাগুলো সঠিকভাবে করা হয়নি। রাজা-অরুণ মারা যাওয়ার পর গণহারে বিএনপি নেতা-কর্মীদের নামে কেস দেয়া হয়েছে। এটা খুব অন্যায় হয়েছে। রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে হয়রানি করতে গিয়ে মামলাগুলো শেষ করে দেয়া হয়েছে। এখন তো এটাই চলছে। এখন গণহারে আওয়ামী লীগ নেতা-কর্মীদের নামে কেস দেয়া হয়েছে। ফলে কোনো হত্যাকান্ডেরই সঠিক বিচার করা সম্ভব হচ্ছে না বা হবে না।' আগে আত্রাই-রানীনগরে ছিলো এমন কিছু পুলিশ কর্মকর্তার সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তারা এর সত্যতা স্বীকার করেন। এ বিষয়ে সাবেক বাণিজ্যমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগ নেতা আব্দুল জলিলকে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, 'আওয়ামী লীগের কর্মীরা কি নিজেদের লোককে হত্যা করবে? এসব করেছে বিএনপি নেতৃবৃন্দের ছত্রছায়ায়। যে কারণে তাদের নামে মামলা হয়েছে। পুলিশ তদন্ত করেছে, তাদের সম্পৃক্ততাও পেয়েছে। এখনও নিরপেক্ষ তদন্ত হলে প্রমাণিত হবে তারাই আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীদের হত্যা করেছে। জনগণের দৃষ্টিভঙ্গি অন্যদিকে সরানোর জন্য তারাই পূর্ব বাংলার কমিউনিস্ট পার্টির লিফলেট ছেড়েছে।' আব্দুল জলিল মনে করেন, সবগুলোই রাজনৈতিক হত্যাকান্ড। আলমগীর কবির বলেন, 'আওয়ামী লীগের আমলে হত্যার পরে মিথ্যা মামলা দিয়ে বিএনপির নেতা-কর্মীদের এলাকা ছাড়া করেছে। ফলে প্রকৃত হত্যাকারী সব সময় ঘটনা ও মিথ্যা মামলার আড়ালে পড়ে গেছে। সবগুলো হত্যাকান্ড তারা নষ্ট করে ফেলেছে। আওয়ামী লীগ যে কাজ করেছে আমি সে কাজ করবো না। আমার হাত দিয়ে কারও নামে মিথ্যা মামলা হবে না এ কথা আমি আপনাকে নিশ্চয়তা সহকারে বলতে পারি। যখন ভাবি তাদের নেতা-কর্মী খুন হয়েছে, কিন্তু আওয়ামী লীগ শুধু আমাদের হয়রানি করার জন্য মামলাগুলো নষ্ট করেছে তখন খুব খারাপ লাগে।' নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একজন গোয়েন্দা কর্মকর্তা জানান, 'সর্বশেষ হত্যাকান্ডগুলো ঘটেছে সামনের ইউপি চেয়ারম্যান নির্বাচনকে কেন্দ্র করে। আমরা জানতে পেরেছি, এসব ঘটনার নেপথ্যে রয়েছে

দীঘির পাড়গ্রামের ইব্রাহীম। সে আগামী নির্বাচনে ইউপি চেয়ারম্যান হতে চায়। এজন্য তার সম্ভাব্য প্রতিদ্বন্দ্বীকে সে আগেই সরিয়ে দিচ্ছে। পুলিশকে ঠিকভাবে কাজ করতে দিলে বিএনপি নেতা ইব্রাহীম গ্রেপ্তার হবেই।' তিনি আরও জানান, এই ইব্রাহীমকে শেল্টার দেয় আত্রাই থানা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক তসরিম। আলমগীর কবির এই ধারণাকে উড়িয়ে দেন। তিনি বলেন, 'এসব কথা আওয়ামী লীগের লোকজন ছাড়াচ্ছে। এটা হতেই পারে না। তসলিমের ক্ষেত্রে তো কথাটা একেবারে অবিশ্বাস্য'।

হত্যাকান্ডের নেপথ্যে যারা

রানীনগর-আত্রাইয়ে ব্যাপক অনুসন্ধান চালানো হয় হত্যাকারীদের সম্পর্কে। অনুসন্ধানে জানা যায়, পূর্ব বাংলার কমিউনিস্ট পার্টির এলাকায় ঐভাবে সংগঠন না থাকলেও তাদের লাইনের দু'একজন লোক রয়েছে। জানা যায়, এদের একজন আত্রাই থানার কালীগঞ্জের মতিয়ার। অনেক আগে থেকেই সে হত্যার রাজনীতির সঙ্গে জড়িত। দীর্ঘদিন কারাগারে আটক থাকার পর সে মুক্তি পায়। প্রথম প্রথম চুপচাপ থাকলেও পরে তার লাইনে ফিরে যায়। বছরখানেক আগে তার বাড়ি থেকে পূর্ব বাংলার কমিউনিস্ট পার্টির লিফলেটসহ কুষ্টিয়ার দু'জন লোক গ্রেপ্তার হয়। তারপর থেকে সে পলাতক। একটি সূত্র থেকে জানা গেছে, মতিয়ার এখন রাজশাহীতে অবস্থান করছে। সূত্রটি জানায়, তার সঙ্গে দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের চরমপন্থিদের যোগাযোগ রয়েছে। প্রায় প্রতিটি হত্যাকান্ডের মূল ঘাতক হিসেবে যার নাম এসেছে, সে হলো বাদশা। রানীনগরের শিকারপুর গ্রামে তার বাড়ি। নৈদীঘির ইউসুফ আলীর সঙ্গে পূর্ব বাংলার কমিউনিস্ট পার্টির যোগাযোগ রয়েছে বলে এলাকাবাসীর ধারণা। আত্রাইয়ে আলমগীর কবিরের বিরোধীপক্ষ আবুলেরও যোগাযোগ আছে বলে এলাকার অনেকেই মনে করেন। অনুসন্ধানে জানা গেছে, এই দুই থানায় কিলিং গ্রুপের নেতৃত্ব দেয় বাদশা। এই গ্রুপে মোট ১৪/১৫ জন সদস্য রয়েছে। যে কোনো মিশনে যাবার আগে এদের সঙ্গে যোগ দেয় বাইরের বিভিন্ন জেলা থেকে আরও ৭/৮ জন। অনুসন্ধানে জানা যায়, বাদশার কোনো রাজনৈতিক দর্শন না থাকলেও তার সঙ্গে বিভিন্ন এলাকার চরমপন্থিদের যোগাযোগ রয়েছে। দীর্ঘ নয় মাস ধরে আত্রাই থানার একজন পুলিশ অফিসার হত্যাকান্ড সম্পর্কে জানার জন্য তদন্ত করেন। এ অবস্থায়ই তাকে বদলি করে দেয়া হয়। অনেক কষ্টে তাকে খুঁজে বের করা সম্ভব হয়। কথা বলতে চাইলেন, তবে তার আগে শর্ত দিলেন দুটি। এক. তিনবার কসম কাটতে হবে, দুই. কোনোভাবেই তার নাম প্রকাশ করা হবে না। তার শর্ত রক্ষার কথা দিলে তিনি বলেন, 'আমি যখন সকল কাজ প্রায় শেষ করে আনছিলাম তখন আমাকে সরিয়ে দেয়া হয়। অসমাপ্ত কাজ আমি বুঝিয়ে দিয়ে আসি আত্রাই থানাকে। তারপরে কিছুই হয়নি আমার জানা মতে। যা হোক, আমি নিশ্চিত করে বলতে পারি সব হত্যার হোতা হল বাদশা। সে-ই মূলত পূর্ব বাংলা বা সন্ত্রাসীদের সামরিক শাখার প্রধান। রানীনগরের গৌতম মাস্টার রাজনৈতিক শাখার প্রধান বা সেই অন্য দলগুলোর সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করতো। এদের সঙ্গে আছে নৈদীঘির ইউসুফ, মহাদীঘির ডাবলু, পতিশরের শামসু, রানীনগরের রঞ্জিত, ইউসুফের ছেলে বাবুসহ আরও কয়েকজন। এদের সবাইকে গ্রেপ্তার করতে পারলে রানীনগর-আত্রাইয়ের মানুষ শান্তিতে ঘুমোতে পারবে।' অন্য একটি সূত্র জনায়, দীঘির পাড়ের ইব্রাহীম, জাত আমরুলের জামসেদ ও একই গ্রামের আক্কাসের এই গ্রুপের সঙ্গে যোগাযোগ রয়েছে। পুলিশের নিষ্ক্রিয়তা, রাজনৈতিক নেতাদের প্রকৃত হত্যাকারী সম্পর্কে উদাসীনতার কারণে এরা একের পর এক হত্যা করে যাচ্ছে।

> হত্যাকারীরা সোবহান চৌধুরীকে টেনে হিঁচড়ে বাস থেকে নামায়। তারপর জীবিত সোবহান চৌধুরীকে বাসের সিড়ির গোড়ায় ৪/৫ জন ঠেসে ধরে। একেবারে পশু কোরবানির মতো। এরপর গলায় ধারালো ছুরি চালায় একজন। মুহূর্তেই জীবিত মানুষটি জবাই হয়ে যায়। সদ্য জবাই করা দেহটি কিছুক্ষণ ছটফট করার পর একসময় নিস্তেজ হয়ে আসে। শেষ হয় একটি জীবন, একজন মানুষের সফল কিংবা অসফল অধ্যায়। এরপর হত্যাকারীরা উল্লাস করতে থাকে। বাসটি তখনও দাঁড়িয়ে। যেন একজন যাত্রী প্রয়োজনে নিচে নেমেছে, ফিরে এলেই গন্তব্যে ছুটবে

সর্বশেষ সোবহান চৌধুরী হত্যা মামলায় বগুড়া পুলিশ বাবু নামক এক যুবককে গ্রেপ্তার করে। বাবু তার জবানবন্দিতে ১৪ জনের নাম বলে। সে এ হত্যাকান্ডে নিজে জড়িত থাকার কথা অস্বীকার করলেও অন্যান্য হত্যাকান্ডের সঙ্গে তার সম্পৃক্ততার কথা স্বীকার করে। বগুড়া পুলিশের একটি সূত্র জানায়, সাপ্তাহিক ২০০০-এর অনুসন্ধানে যাদের নাম এসেছে বাবু তাদের অনেকের নামই বলেছে। সূত্রটি আরও জানায়, 'সোবহান চৌধুরীকে হত্যার জন্য ইব্রাহীম তাদের ভাড়া করে। পরবর্তী ইউপি নির্বাচনে ইব্রাহীম নিশ্চিতভাবে জিততে চান বলেই সম্ভাব্য প্রতিপক্ষকে সরিয়ে দেন ভাড়াটিয়া খুনিদের দিয়ে। বাবু তার স্বীকারোক্তিতে এ কথাও বলেছে বলে জানা যায়। ইউসুফ আলী ভারত পালিয়ে যাচ্ছে এমন খবর বগুড়া পুলশ নওগাঁ পুলিশকে জানালেও তাকে গ্রেপ্তারে কোনো উদ্যোগ নেয়া হয়নি বলে অনুসন্ধানে জানা যায়।

এলাকাবাসীর সঙ্গে কথা বলে একটি বিষয় পরিষ্কার হয়, আলমগীর কবির বা ওহিদুর রহমান কেউ এখন আর হত্যার রাজনীতির সঙ্গে সম্পৃক্ত নয়। তবে আলমগীর কবিরের ছোটভাই আনোয়ার হোসেন বুলু সম্পর্কে এলাকাবাসীর বেশ কিছু অভিযোগ আছে। আলমগীর কবির বলেন, 'আমি সন্ত্রাসীদের কখনই প্রশ্রয় দিই না। চ্যালেঞ্জ করে বলতে পারি। আমার সন্ত্রাসী পোষার দরকার নেই। পরপর ৪ টার্ম এমপি আমি। এক সময় ভাসানী ন্যাপ করেছি, মানবতার পক্ষে কাজ করেছি, ভবিষ্যতেও করবো।'

এক সময় নওগাঁ দেশের বৃহত্তম খাদ্য উৎপাদনকারী জেলা ছিলো। এখন সন্ত্রাসের জনপদ বলে খ্যাত। পুলিশ ইচ্ছা করলেই এসব সন্ত্রাসীদের ধরতে পারে। এদের গ্রেপ্তার করে বিচার করতে পারলে জনগণের জীবনযাপন স্বাভাবিক হয়ে আসবে। জানা গেছে, আলমগীর কবির ঐ এলাকায় সকলের জন্য অস্ত্র উন্মুক্ত করে দেয়ার সিদ্ধান্ত নিতে যাচ্ছে। লাইসেন্সের আবেদন করলে সাধারণ মানুষকে অস্ত্র দেয়া হবে। যাতে মানুষ বৈধ অস্ত্র দিয়ে অবৈধ সন্ত্রাসীদের রুখতে পারে। তবে এক্ষেত্রেও সরকারকে সাবধানী হতে হবে। কোনোভাবে যদি এই অস্ত্র সন্ত্রাসীদের হাতে পৌঁছায় তবে এই অস্ত্র সাধারণ মানুষের ওপর ব্যবহার হবে। রানীনগর-আত্রাইয়ের মানুষ আশা করে সরকার শীঘ্রই হয়ত এমন কোনো পদক্ষেপ নেবে যাতে তারা স্বাভাবিক জীবনে ফিরতে পারে। সাপ্তাহিক ২০০০-এর মাধ্যমে তারা জানতে চেয়েছে, সরকার আদৌ ব্যবস্থা নেবে কি?